ULKA

& PENCIL

Gargi Bhattacharya

****

Copyrighted material

Forget safety

Live where you fear to live

Destroy your reputation

Be notorious !

If you are irritated by every rub , how will your mirror be polished ?

---Jalaluddin Rumi

Persian Poet .

২টি বই

উল্কা ও

পেন্সিল

গার্গী ভট্টাচার্য

উল্কা

উল্কা একজন নারীর নাম । তার ও আমার বসবাস ওলিম্ দেশে । এই বীরাঙ্গনা সম্পর্কে আমি দুধরণের মতামত পেয়েছি । সফল মানুষের সম্পর্কে নানান মতামত ভেসে বেড়ায় । কিন্তু এর বেলায় মাত্র দুটি বাজারে উড়ে বেড়াচ্ছে । একটি লোকাল মানুষের কাছে পেলাম আর অন্যটি ভারতের এক পড়শী দেশ হোপি থেকে ।

দুটি মতামতই এখানে লিপিবদ্ধ করলাম ।

উপসংহার রেখে দিলাম পাঠকের জন্য । পাঠকই বিচারক । আসল উল্কা ঠিক কী খাবেন , পার্থিব আকাশ নাকি সুদূরের নীহারিকার মায়াজালে আবদ্ধ মহাকাশ তা স্থির করবেন পাঠকেরা । আমি কেবল দুই উল্কার চরিত্র এঁকে দিলাম । ঠিক যেমনটা শুনেছি দুপক্ষের কাছ থেকে । একে অববাহিকা থেকে

উপসাগর করার দায়িত্ব শ্রোতার । আমার একার কম্মো না । জীবনে মনে হয় এই প্রথম হার স্বীকার করলাম ।

প্রথম পক্ষ:

ওলিম্ দেশে, উল্কা একটি নামী প্রাইজ পেয়েছে একজন নারী শিকারী হিসেবে । সে কালো মানুষ। তায় রমণী । এই প্রথম একজন নারী এই প্রাইজ পেলো তাই দেশবাসী খুব খুশি । আসলে সে মূলতঃ হরিণ ও বন্য শূকর, মোষ, শিয়াল, নেঁকড়ে, হায়না , ঘোড়া, ক্যাঙারু ইত্যাদি শিকার করলেও একটি জাপানী ভ্রমণার্থীর দলকে, বন্য পশুর হাত থেকে রক্ষার জন্য এই প্রাইজ পায় । বলা হয় যে একজন নারী যে এইভাবে একা লড়াই করে, হিংস্র কুকুরের দলের হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে আনতে সক্ষম তা নাকি আগে কেউ টের পায়নি । তাও যে শখের শিকারি !

দেশেরও মুখ রক্ষা হয় ।

লম্বা ও কালো মেয়ে উল্কার মাথার চুল নাকি সবুজ । আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি । লোকে বলে সে নাকি একটি বনে থাকে । আমি সেই বনে পিকনিক করতে গিয়েছি কিন্তু কোনোদিন তার দেখা পাইনি । তার বাড়িটিও আমি দেখেছি ।

অনেক সময়ই এমন হয়েছে যে তার বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেছি । মনে করেছি হয়ত রান্না করছে । কারণ আমি নিজে তখন পিকনিকে মাংস শেঁকে নিচ্ছি খাবার জন্য ।

* * *

উল্কা নাকি এখানে আসার আগে ভারতে এক এক্সপ্লোসিভ্ বিশারদ্ ছিলো । সেইসব নিয়ে কোথাও কাজ করতো । কিন্তু লোকে ওকে ব্যঙ্গ করতো যে ও ধ্বংসাত্মক কাজের সাথে যুক্ত । ও তাদের বোঝাতো যে এক্সপ্লোসিভ্ কেবল ধ্বংসে নয় অনেক জিনিস জোড়া দিতেও ব্যবহার করা হয় । বিশেষ করে ধাতু ।

ওর স্বামী পিরামল ওকে বলতো , কে কী বলছে তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়েও না । নিজের মন যা বলে তাই করে যাও । লোকে বসেই থাকে পেছনে লাগার জন্য ।

তবুও পরে ও বিস্ফোরণ ছেড়ে শিকারে চলে যায় । কিন্তু শিকারে গিয়েও মনে হতো যে এও তো একজাতের ধ্বংস ! তখন আবার স্বামী বলতো যে দুনিয়ায় সবকিছুই কারোর কাছে ভালো আবার কারো কাছে মন্দ । কাজেই নিজের যা ভালো মনে হয়

তাই করো । আর সবই তো ধ্বংস । গাছ ধ্বংস তাই খাওয়া , কাগজ তৈরি, মাটি ধ্বংস তাই ফ্ল্যাট, সুপার মার্কেট আবার পরিবেশ ধ্বংস তাই উন্নয়ন এসব চলবেই । নিজের কাছে সৎ থাকাটাই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ।

উল্কা আর পিরামল হল ভারতের পশ্চিম প্রান্তের লালপান রাজ্যের মানুষ । ওখানে হেরিং সম্প্রদায় বাস করতো । তারা দূর্ধর্ষ লোক । অনেক আগে তারা তাদের রাজার হয়ে যুদ্ধ করতো । আমাদের রাজপুতদের মতন সাহসী ছিলো । কোনো যুদ্ধেই তাদের হারতে দেখা যেতো না । এমন সাহসী ছিলো তারা । প্রতি যুদ্ধের আগে মায়ের মানে শক্তির পুজো দিয়ে সংহারে যেতো । কিন্তু পরে দেশ স্বাধীন হলো । রাজা, মহারাজাদের রাজ্য সমস্ত সরকার নিয়ে নিলো । তখন থেকে শুরু হেরিং সম্প্রদায়ের সমস্যার । কিছু মানুষ সরকারের কথা অনুযায়ী লেখাপড়া শিখে কাজে লেগে গেলো । উল্কার বাপ্ ঠাকুর্দা , দলাইদিলি (ওদের গ্রাম) এর পূর্বজরা সকলে মূল স্রোতে মিশে গেলো । কিন্তু সিংহ ভাগ মানুষই যারা সৈন্য ছিলো তারা হিংস্র ডাকাতে পরিণত হল । তাদের বক্তব্য হল--আমরা এছাড়া আর কিছু পারিনা । এটাই একমাত্র কাজ আমরা যা জানি । কাজেই এটাই আমরা করতে পারবো । লেখাপড়া ও টেবিলে বসে কাজ আমাদের দ্বারা হবেনা । আর শাক সবজি বিকিকিনিও আমাদের দ্বারা হবেনা ।

এরপরই শুরু হল বেআইনি রোজগারের খেলা । অথচ ওরা একে বেআইনিও মনে করেনা । শুরু শহরে , নগরে , গ্রামে অস্বাভাবিক আকারে ডাকাতি । এরকম হিংস্রভাবে ডাকাতি করতে আগে কেউ দেখেনি । এবং মজার ব্যাপার হল এই দলকে ধরতে সাধারণ পুলিশ বাহিনীর নাজেহাল অবস্থা । রীতিমতন স্পেশাল ফোর্স গঠন করতে হয় এদেরকে ধরার জন্য । এরা যেহেতু যোদ্ধা ছিল ও বংশ পরম্পরায় রীতিমতন বীর কাজেই নানান ধরণের যুদ্ধ কৌশল এদের আয়ত্বে ছিলো । গেরিলা ওয়ার করতেও সক্ষম ছিলো । অন্ধকারে পশুর মতন ডাক দিয়ে মানুষকে দিক্‌ভ্রষ্ট করা , বৃক্ষের ওপর থেকে লাফিয়ে পরে মেরে কাবু করা , গাছের ডাল থেকে ডালে শাখামৃগের মতন ঝুলে ঝুলে শত্রুর থেকে পালানো ইত্যাদিতে পটু এই দলকে ধরার জন্য পুলিশ বাহিনীকে রীতিমতন ইজরায়েলের মার্শাল আর্ট **ক্রাভ মাগা** জানা অফিসারদের দলে নিতে হল ; এই তস্কর বাহিনীকে ধরার জন্য ।

আমি এই গপ্পোটা এতক্ষণ শুনছিলাম এক ব্যাক্তির কাছে সে এসেছে এদেশেতে আরেক দেশ থেকে চাষীর ভিসা নিয়ে । এখানে চাষীদের বিশেষ ভিসা দিচ্ছে কৃষিকাজের জন্য । এদেশে তো অনেক কৃষিকাজ হয় এবং বেশ উন্নত ধরণের অথচ লোক কম তাই বাইরে থেকে এসে যদি কেউ কাজ করে দেয় তাহলে

বেশ ভালো হয় ; সেজন্য এই ভিসা দেওয়া হচ্ছে । এই মানুষটি সেই ভিসা নিয়ে এসেছিলো । নাম পান্ডু । এর এক পরিচিত লোক, তার নাম আজান-- সে নাকি আগে উগ্রপন্থী ছিলো ।

মূলত মরুভূমির দেশ, শাকাকি তে কোনো পাহাড়ি এলাকায় থাকতো । সেখানে কাজকম্মো মানে দরাজ গলায় গান করে খেতো । কিন্তু হোপি দেশ থেকে উগ্রপন্থীরা জোর করে সেখানে ঢুকে ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে নিয়ে গিয়ে উগ্রপন্থী বানিয়ে দিতো । অন্য ধর্মের মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মোরাগ ধর্মে পরিণত করে উগ্রপন্থীদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো । এইসবই হোপি দেশে হতো যেখানে মোরাগ ধর্মের আতঙ্কবাদীরা থাকে এবং এই দেশ ভারতের পাশেই। সেইভাবেই আজানকেও ওরা ধরে নিয়ে যায় । তার বয়স তখন এই ২৩/২৪ বছর । একটি পুত্র হয়েছে কিছুদিন হল । নাম দিয়েছে জিহাদ্ ।জিহাদের অর্থ অন্তরের শত্রুকে দমন করে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করো । সেজন্য সুন্দর নামখানি দিয়েছে । কিন্তু অপূর্ব মুসলিম নামটির মর্ম না বুঝে মোরাগ দেশ হোপির র‍্যাডিক্যাল ঐ দল জোর করে আজানকে ধরে নিয়ে যায় । বলে - তোর নাম আজান আর তোর ছেলের নাম জিহাদ্ ! কাজেই তোরা বাড়ি থাকিস্ কীভাবে ? তুই আমাদের হয়ে কাজে লেগে পর । জিহাদ্ বড় হলে তাকে আমরা ট্রেনিং দেবো ।

ওর স্ত্রী আসফানিকে কুপিয়ে মেরে চলে যায় ঐ দল । তারপর থেকেই ওদের কব্জায় আজান আর জিহাদ্ !

জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী তৈরি করা হলেও এই লোকটি পরে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে কিন্তু ওর ছেলেকে ওরা খতম করে দেয় । পত্নীকেও আগেই জবাই করা হয়েছে । কাজেই ফিরে যাওয়ার কোনো জায়গা ছিলোনা । ওর পারিবারিক যে কাজ ছিলো তাহল কাওয়ালি গান করা সেটাও বন্ধ হল উগ্রবাদী রূপে চিহ্নিত হওয়ায় । নিরাকার ঈশ্বরের নামে গান লিখে মানব সমাজে ওরা ভগবৎ প্রেম বিলাতো সুললিত ছন্দে , উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাধ্যমে । মনে শান্তি আসতো । কিন্তু সে কাজ আর হবেনা !

পরে বিশেষ ভাবে ওলিম্ দেশে যায় । এইদেশ ক্ষমাশীল দেশ তাই পুরো জিনিসটা জেনে তাকে কাজ দেয় । শুধরানোর একটা সুযোগ দেয় । কিছুদিন ওলিম্ দেশের গুপ্ত সংস্থা **হুরের** হয়েও কাজ করে । আমরা যেমন হলি/বলিউড মুভিতে দেখি সেরকম নাকি লোকে সত্যি সত্যি অপারেশন করে মুখ বদলে নেয় । স্পাই আর ক্রিমিন্যালরা । ও নাকি দেখেছে ।

একবার ও দেখেছে একজন চিকিৎসক এক স্পাইকে একেবারে অন্য চেহারা দেবার জন্য অপারেশান করে তার দন্ত, চোখের গঠণ, চোয়াল , নাক মায় কানের লতিও বদলে দেন ।

আজকাল নাকি কচিকচি শিশুদেরও তাদের বাপ্ মায়েরা সুন্দর করে নিয়ে আসে এইভাবে, নকল দেবতার দোকান থেকে ।

ভদ্রলোক সেখানেই মানে সেই দেশেই নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়, স্টেনলেস্ স্টিলের গহনা বানায় । বলে --স্টিল খুব চক্‌চকে আর রং চটে না কিন্তু বেজায় শক্ত তাই সহজে রূপা অথবা অ্যালুমিনিয়ামের মতন বেঁকানো যায়না বলে অনেকে এগুলো নিয়ে কাজ করেনা । কিন্তু আমি করি । ব্রেস্‌লেট, দুল, আংটি, হার সবই বানাই । নতুন নতুন ডিজাইন করা আমার কাছে এক চ্যালেঞ্জ । যখন সব স্যাঁকরা না বলে দেবে তখন আমি সেটা করে দেবো ।

লোকটিকে দেখলে মনে হবেনা যে এর এইধরণের কোনো অতীত আছে ।কম কথা বলে , আস্তে ধীরে কথা বলে । তবে অতীত নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয় । ওর নাকি জিহাদের কথা মনে পরে যায় ।বুকের ভেতরে একটা চাপা কষ্ট হয় । বুক ধড়ফড় করে । প্রেসার বেড়ে যায় ।

করুণ চোখে শুধায় , আচ্ছা, মানুষ মরলে কী হয় ? সত্যি কি জন্নাৎ বলে কিছু হয় ?

আমার একটা স্টিলের চুড়ির দরকার ছিলো । আমার হাতের মাপ ভীষণ ছোট । চুয়ান্ন সেন্টিমিটার । তাই সহজে বাজারে

কিনতে পাওয়া যায়না । আমি আজানকে অর্ডার দিতেই সুন্দর নক্সা করা ব্রেসলেটটি সে আমার হাতে ধরিয়ে দেয় সময় মতই । ও হ্যাঁ বলা হয়নি, ওর নাম এখন আজান নেই । ও এখন সাহাদাৎ । সাহাদাতের আবার আরেকটি বিশেষত্ব আছে । সে কোনো অলঙ্কারই নিঁখুত বানায় না । একটু ছোট খুঁত রেখে দেয় । এটা নাকি সে শিখেছে ইরানীদের কাছে থেকে । ইরানীরা তো কার্পেট বোনায় ওস্তাদ । কিন্তু তাদের বিশ্বজোড়া নাম যেই পার্শিয়ান কার্পেটে বোনায় তা কখনই নিঁখুত বোনে না তারা । একটুখানি খুঁত তাতে রেখে দেয় । কারণ তাদের মতে একমাত্র আল্লাহ্ নিঁখুত । বা পার্ফেক্ট ।

আমি শুধাই , ইরানীকে পেলে কোথায় ?

সে বলে , এইদেশে এসে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি । ওরা খুব দিলদরিয়া মানুষ । যখনই দেখা হয় কেবল হাসে । ইরান-ইরাকের যুদ্ধ তো কতবছর ধরে চলেছে তবুও এত প্রাণখোলা হাসি কোথা থেকে আসে কে জানে ! মেয়েরা তো আসে গয়না বানাতে । সবাই আমাকে নেমতন্ন করে যায় তাদের বাড়ি । এখনও অবধি যাওয়া হয়নি অবশ্যি ।

ওর কারখানার নাম বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় চাঁদসিঁড়ি ।

যেখানে ওরা বসবাস করতো সেখানে নাকি মরু ছিলো । আর অন্যদিকে পাহাড় । পাহাড়গুলো আজব । গাঢ় বাদামী আর মনে হবে কেউ ভাঁজ করে রেখেছে বা কুঞ্চিত হয়ে গেছে পাহাড়ের মৃত্তিকা ।নীল নদী , সবুজ ক্ষেত আর রাতে একফালি চাঁদ ও অসংখ্য তারা ।

মনে হতো চাঁদে উঠে পড়া যাবে পাহাড়ের চূড়া বেয়ে , দোকানের নাম তাই চাঁদ সিঁড়ি ।

আমি বলে উঠি -- তোমার গ্রামকে খুব মিস্ করো তাইনা ?

সে হসে বলে , কৈশোরটাই তো সবচেয়ে সতেজ ও সুন্দর হয় । যেকোনো মানুষের । তাকে কেউ ভুলতে পারে ।

ওর গভীর, ভেজা চোখের দিকে চেয়ে বলে উঠি --- আরেকবার বিয়ে করলে হয়না ? সেই অভিজ্ঞতাও তো মধুর -কেউ কি ভুলতে পারে ?

চুপ করে থাকে । মুখটা গম্ভীর হয়ে যায় ।

আমার একটু লজ্জাও লাগে । বড্ড বেশি কথা বলে ফেলছি নাতো !

ভাব আছে কিন্তু হয়ত বেশি সীমারেখা অতিক্রম করে ফেলেছি ।

আজান থুরি সাহাদাৎ কিন্তু ক্রুদ্ধশীল নয় । একটু লাজুক হেসে বলে ,ম্যাম্ আপনিও একটা বললেন বটে ! একটা এক্স টেররিস্ট্কে কে বিয়ে করবে ?

আমি বলি , তুমি বলবে না । তোমার সাথে মিশে দেখবে তুমি আসলে কিরকম মানুষ । তখন সব খুলে বলবে । আর তুমি তো নিজের ইচ্ছেতে যাওনি ওরা তোমায় কিড্ন্যাপ করেছিলো । যেকোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই বুঝবে জিনিসটা ।

ও চুপ করে থাকে । তারপর বলে ওঠে , তখন আমাকে চোর বলবে, অসৎ বলবে । বলবে নিজের আসল পরিচয় লুকিয়েছি । মানুষ অত সহজে কিছু বোঝেনা । সবাই বিচারক । নিজের বেলায় ভিক্টিম্ কার্ড প্লে করে অন্যের বেলায় কুরুচিকর মন্তব্য করেই খালাস । কাজেই আমাকে কেউ নেবেনা । আমার বাবা অনেকগুলি বিয়ে করেছিলো । বেশিরভাগ মহিলাই কুশ্রী এবং আমার মায়ের মৃত্যুর পরেই বাবা তাদের বিয়ে করে । কেউ বিধবা তো কেউ এত কুৎসিত যে তার বিবাহ হবার সম্ভবনা প্রায় নেই । কেউবা হতদরিদ্র । আমার বাবা একজন প্রতিষ্ঠিত কাওয়ালি গায়ক হিসেবে বেশ কটি বিয়ে করে ; মেয়েগুলোকে উদ্ধার করার জন্য । কোনো লালসায় করেনি । কারণ আমাদের ওদিকে এদের পরিণতি হতো কোনো সন্ত্রাসবাদীর গৃহিনী হওয়া কিংবা পাচারকারীর কবলে পড়া । কেউ তখন মেয়েগুলোকে

বাঁচাতো না অথচ বাবার চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটাতে কেউ ছাড়েনি । মৃত মায়ের জন্য সবার সমবেদনার শেষ ছিলো না ।

অনেক পরে জানতে পারি যে এক ক্রেতার সাথে এই ব্যাক্তির বেশ ভাব হয় । মেয়েটি এসেছিলো পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশ থেকে । যুদ্ধে সমস্ত হারিয়ে এখানে আসে । দুজনে ভারি জমে ওঠে । কিন্তু কথায় বলেনা অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকায়ে যায় সেরকমই বোধহয় হয় এর সাথে । মেয়েটি , যার নাম সোহো সে নাকি ইস্টারে বেড়াতে যায় একটি মহাসাগরের দ্বীপে । কথা ছিলো ফিরে এসেই দুজনে ঘর বাঁধবে । কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ বার হয় লাভা ! আগ্নেয়গিরির লেলিহান শিখায় পুড়ে যায় মেয়েটি । এয়ার লিফ্ট করা হলেও পরে মারা যায় । অবশ্যি সাহাদাৎ ওকে দেখতে যেতে পেরেছিলো । সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহ থেকে ঢাকনা সরিয়ে মুখটা ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সে ।

আমি যার কাছে এসব শুনেছি সে বলে ওঠে , এরকমভাবে কাঁদতে আমি কোনোদিন কোনো টেররিস্টকে দেখিনি !

-শালা শূয়োরের বাচ্চা, কটা টেররিস্ট দেখেছিস্ লাইফে ? মুখ দিয়ে গালি বেরিয়ে আসে । এমনিতেই আমার মুখের ভাষা খুব

খুব খারাপ । তবে বাইরে ভদ্রতার মুখোশ থাকে । মেয়েদের মুখে এত গালাগালি সমাজের সইবে না !

কাচুমাচু মুখ করে ছেলেটি বলে ওঠে পাশ্চাত্য ঢঙে সেই চিরাচরিত, সরি !

আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ । ভীষণ রেগে গেছি । এরা কাউকে বাঁচতে দেবেনা ।

তোরা এত জাজমেন্টাল কেন ? কেন তোরা মানুষকে এত হেয় করিস্ ? কেন এত বিভাজন তোদের মনে ? এজন্যেই তো এত লড়াই দুনিয়া জুড়ে ! তোরা কাউকে একটু ক্ষমা করতে পারিস্ না ? আর তোর দাদুর কথা ভুলে গেছিস্ ? হি ওয়াজ আ নক্শাল ! আ ব্লাডি মার্ডারার ইন দা নেম অফ্ দেশভক্তি । ৩৯ খুন করেছিলো তোর বাপের বাপ্ , আছে এখনো ইন্ডিয়ার নক্শালাইটদের সাথে তোদের যোগাযোগ ? Your pussy ass mother fucker grand father !

থরথর করে কাঁপছি আমি ! ছেলেটি ভয় পেয়ে গেছে । আমাকে এত রাগতে দেখেনি কোনোদিন ।

কোনোরকমে সামলে কেটে পড়ে ।

* * *

দ্বিতীয় পক্ষ

উল্কার শিকার খুব ভালোলাগতো । বলতো নাকি যে শিকার হয় লুকায় নয় পালাবার চেষ্টা করে । কিন্তু শিকারীর কাছে একটাই পথ খোলা থাকে । একটামাত্র জিনিসই সে করতে পারে । তাহল শিকারকে খতম করে ফেলা ।

তবে ঐ নিরীহ হরিণ টরিণ মেরে কিংবা ক্যাঙারু ওর মাঝে মাঝে খুব দু:খ হতো যে ও গড়েনা , ভাঙে । তাই অন্তর থেকে কিছু গড়ে দেবার এক অদম্য ইচ্ছে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো ।

হোপি দেশে গিয়ে জানতে পারলাম যে লালপান রাজ্যের ঐ হেরিং গোষ্ঠিকে মানে যারা ডাকু, তাদের পুলিশ হোপি দেশে চালান করে দিয়েছিলো । বলেছিলো -- তোরা আত্মসমর্পণ কর তাহলে তোদের ওখানে পাঠিয়ে দেবো বর্ডার পার করে । ওখানে গিয়ে এসব করে খাবি । ওরা আমাদের শত্রু । কাজেই ওদের ক্ষতি হলে আমাদের কিছু না । আর ওরা খালি আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে । কাশ্মীর নিয়ে গোলমাল করছে । বোমব্লাস্ট করছে । ঝামেলা পাকাচ্ছে নানান ভাবে । কাজেই তোরা ওখানে গিয়ে

ঝামেলা করলে একধরণের দেশ সেবাই হবে । কোনো পাপ হবেনা এতে ।

এসব বলে হেরিং এর ডাকু সম্প্রদায়কে হোপি দেশে চালান করে দেওয়া হয় ।

হেরিং সম্প্রদায় আবার শক্তির মানে ভ্রামরি দেবীর পুজো করে ডাকাতি করতে যায় । ভ্রামরি দেবী নাকি রাশি রাশি ভ্রমরা তাক করে শত্রু নিধন করেন ।

ওদের পূজারী হয়না। সবাই পূজারিণী । আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃতা এইসব নারী বিড়ি ফোঁকে, চেন স্মোকার আর বড় বড় কাজলের টিপ পরে কপালে । এরাই মা ভ্রামরির পুজোতে বসে । পুজো হয়ে গেলে মায়ের প্রসাদ খেয়ে যায় মিশনে । এইসব পূজারিনীর একপ্রকার শক্তি আছে । তারা প্রথমে শিকারকে হিপনোটাইজ করে বশ করে ফেলে । তারপরে পুরুষেরা গিয়ে লুটপাঠ করে, শিকারের ক্ষমতার ওপরে ভিত্তি করে । যেমন ধনী হলে, অনেক মালপত্র থাকলে অনেকে যায় । আবার দুজন হয়ত অনেক টাকা নিয়ে যাচ্ছে নিঝুম রাতে আর ঠিক তখন তাকে বশ করেই কাজ সেরে ফেলে দু-একজন হেরিং ডাকু ,এইরকম আর কি ।

এই হেরিং দলের সবার গায়ে উল্কি আঁকা থাকে । কে কত মানুষ মেরেছে তার প্রমাণ হিসেবে । যে যত মানুষ মেরেছে ততগুলো কঙ্কালের চিহ্ন এঁকে রাখে দেহে । এইভাবেই পরবর্তীতে ওদের দলনেতা নির্বাচিত হয় । এরা বাদামী তবে সাহেবদের ভাষায় কালো ।

উল্কা এই সংবাদ আন্তর্জালে দেখে একদিন সোজা হাজির হয় ঐ দেশে ।ওদের খুঁজে বার করতে সময় লাগলেও সমস্যা হয়না এই উল্কির কারণেই হয়তবা । নিজেকে ঐ সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই পরিচয় দেয় এবং ওদের বলে যে নিজের কমিউনিটিকে এইভাবে কলঙ্কিত না করে ও ভালো কিছু করে দেখাতে চায় বলে এত্তোদূর থেকে এসেছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দেশে ।পুলিশ ওদের শুভাকাঙ্খী নয় । তাই এইভাবে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে ।

উল্কার কথায় ভরসা পেয়ে নাকি কীভাবে জানা নেই, ওরা ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী হোপি দেশেরই একটি গভীর অরণ্যে সেঁধিয়ে যায় ।এই বনানী অসূর্যম্পশ্যা ও অধরা । এত গভীর বনে আজ অবধি কেউ পা দেয়নি । দিতে পারেনি । সবুজ এই বন, হোপি দেশ কেন সারাবিশ্বের কাছেই এক রহস্য ।

অ্যাফ্রিকার মতন নাহলেও এই জঙ্গলও বেশ গহীন আর কী পশুপাখি আছে, লতাপাতা, মহৌষধি তা কেউ জানেনা । এমনকি কোনো আদিম মানব পর্যন্তও এখানে থাকেনা । সেইকারণে অনেকের কৌতুহল এই অরণ্যকে নিয়ে । পন্ডিত , শিকারি , ভেষজ চিকিৎসক, সেনাবাহিনী নানাবিধ্ । অরণ্যের নাম **মাং** । রহস্যময় এই বনে, খন্ডহর খোঁজার দায়িত্ব দিলো উল্কা এই হেরিং সম্প্রদায়কেই । ওরাও খুশি । আর ডাকাতি করতে হবেনা । সেটাকে বেআইনি না মনে করলেও তেমন নতুনত্ব তো নেই । এই কাজটা বেশ রোমাঞ্চকর আর দু:সাহসিক । কাজেই ওরা আনন্দের সাথেই মেনে নিলো ।

ওরা আদতে যোদ্ধা ছিলো । ঠেকায় পড়ে লুঠপাট করতো । আসলে ভালোবাসে দু:সাহসী পদক্ষেপ নিতে ও বাজপাখির মতন উড়তে। উল্কার মতামত মেনে নিয়ে ওদের চেতনায় শীতল স্পর্শ লাগলো , উল্কাপাত হলনা কোনো ।

তবে হেরিং সম্প্রদায় কিন্তু কৃষ্ণভামিনী, এলোকেশী থুরি সবুজ কেশী উল্কাকে একটি গাছ বা বৃক্ষ বলে । সে নাকি মানুষ নয় । ওরা কোনোদিন ভালো মানুষ দেখেনি । মানুষ নামক প্রাণী নাকি ভালো হতেই পারেনা । ওদের বর্তমান প্রজন্ম, মন্দলোকই দেখেছে যারা ওদের নিস্কর্মা করে ছেড়ে দিয়েছে ।

কাজেই উল্কা আদতে একটি বৃক্ষের নাম । আর ও নাকি নিজেই বলেছে যে সে নিঃশ্বাসে অক্সিজেন নেয় না -কার্বন-ডাই-অক্সাইড নেয় আর অক্সিজেন ছাড়ে । তাই ওদের রাতের বেলায় ওর কাছে যেতে বারণ করেছে ।

Note :: There are several tribes in India who are labelled as criminal tribes like babarias, pardhis,charodi,lodha,kanjar etc.

Some of them are linked with criminal activities even today .

Google has enough information on this topic for beginners.

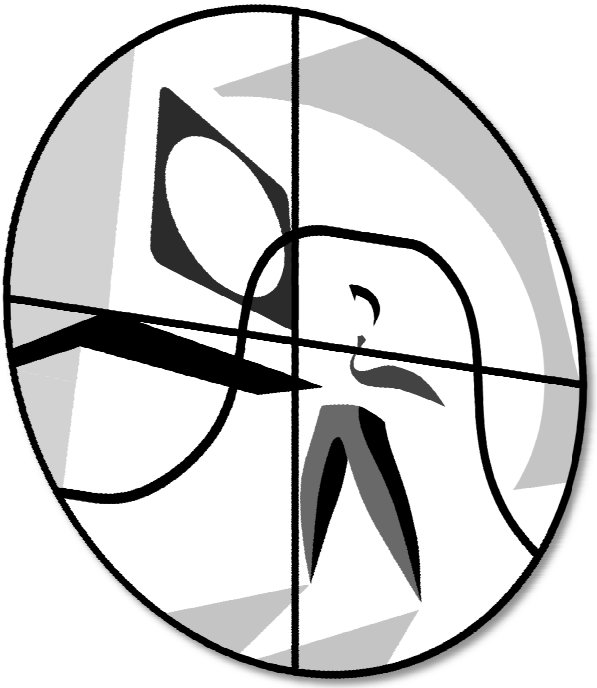

পেন্সিল

গড়িয়ার থেকেও ; ২৪ পরগনার আরো ভেতরে ছিলো পেন্সিলের বাসা । ওরা দুই ভাইবোন । পেন্সিল আর রবার ।ওদের বাবা , মন্টু মন্ডলের পরিবার- চাষী পরিবার । সবজি ও ফলমূল বাজারে বিক্রি করে দিন কাটাতো ওরা । বংশ পরম্পরায় চাষবাস করা এই পরিবারের ইতিহাস বলতে কেবলই ফসল ফলানো ।

নানাবিধ্ ফসল ফলিয়ে বিক্রি করাই ছিলো কাজ । গড়িয়া , তখনও এত জমজমাট হয়নি । তবুও কলকাতার কাছে বলেই বিকিকিনিতে অসুবিধে হতনা মন্ডল পরিবারের । মনসা, শীতলা পুজো ও চড়কের মেলা হত নিয়মিত । মনসা মন্দিরে অনেকদিন ধরে বিকেলে, পাঁচালি পড়া হত সুর করে করে । তার অনেকটা সময় পরে পুজো হত । সাপকে শান্ত করার জন্য এই পুজো ।

সবুজ ক্ষেতেই বেড়ে ওঠে মন্টু । তবুও নিজেকে চাষী বা বাজারের সবজিওয়ালার ছেলে বলে পরিচয় দিতে অত্যন্ত খারাপ লাগতো তার । তাই নিজেকে সবার কাছে শিল্পী বলেই পরিচয় দিতো ।

প্রথমদিকে এক কুমোরের সাথে মিশে গিয়ে কুমারটুলিতে প্রতিমা গড়ার কাজ করতো ।

আজকাল ঠাকুরের মুখগুলি, অভিনেত্রী কিংবা কোনো বড় মানুষের মুখের মতন করতে অর্ডার দেয় অনেকে তাই মন্টুর মনে হত যে সে আর ঠাকুর গড়ছে না বরং মাটির মানুষ বানাচ্ছে । তাই সে মূর্তি থেকে ছায়াতে চলে যায় । ছায়া মানে সিনেমা কিংবা অন্যকিছু নয় ; সে Shadowgraphy (*Hand Shadow Puppetry) করতে শুরু করে ।*

এর জন্য নানান জায়গায় ট্রেনিং নেয় । শেষে স্টেজ শো করতে শুরু করে । অত্যাশ্চার্য এই কলা দেখে মানুষ হাততালি দেবার সাথে সাথে শিখতেও শুরু করে । অভিনব এই শো ! পুরো একটি গল্পকে স্ক্রিপ্ট করে নিয়ে তাই দিতে সাদা ও কালো ছায়ায় ছায়ায় সিনেমা দেখানো । বিশেষ একটি আলোর শিখা নিয়ে কাজ শুরু ।

তা নাম হয় বটে মন্টু মন্ডলের । তবে সে এখন নিজের নাম বদলে করে নিয়েছে-মন্টি ম্যান্ডেলা । ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ তার চাষীত্ব সম্পর্কে জানতে না পারে ! একটি গন্ডগ্রামে, এক অখ্যাত কৃষক পরিবারে তার জন্ম এ যেন মন্টুর কপালে একটি বিশাল কালো দাগের মতন ।

মন্টি ম্যান্ডেলা ইদানিং বিদেশেও যাচ্ছে । এন আর আইদের ডাকে । ওর ওয়েবপেজে লেখা থাকে যে সে আন্তর্জাতিকভাবে সফল মানুষ !

সত্যিই সফল সে । কোনো চরিত্রাভিনেতা ছাড়াই যে বায়াস্কোপ বানানো যায় এ যেন দুনিয়াকে জানাতেই মন্টির জন্ম হয়েছে । আজব আঙুলের নড়ন চড়নে সৃষ্ট এক একটি চরিত্র এতই সাবলীল ও সুন্দর যে লোকে খেয়ালই করেনা যে এই সিনেমায় রং নেই !

ছায়ায় ছায়ায় এর বিস্তার । সত্যিকারের ছায়াছবি আরকি ! পেন্সিল ও রবারের বাবা বলে :: মানুষের ছায়া মানুষের মনের আসল ছবি ফুটিয়ে তোলে । বড় বড় মানুষের , মহামানবদের ছায়াতেই তাঁদের দেখা যায় । আর সাধারণ মানুষের ছায়াই তার ছোট্ট পদচিহ্ন রেখে যায় । তাই আমি ছায়াবাজি নিয়ে কাজ করি । যেকোনো মানুষকে দেখলে আমি তার ছায়াটা কল্পনা করি । সে যেমন লম্বা, বেঁটে, ফর্সা বা কালো সেরকম তার মনের ভালো ও মন্দ দিকও সেই ছায়ায় উঠে আসে ।

শহরের বড় ফ্ল্যাটে থাকে মন্টি ম্যান্ডেলা । অনেকে ওকে আবার খ্রীস্টান মনে করে ।

মন্টি মজা করে বলে :: আমি বারবেল নিয়ে চলি, বাইবেল নয় !

নিয়মিত ভারোত্তলন করতে অভ্যস্ত মন্টি, একজন পরিশ্রমী বীর । ইয়া ইয়া তার পেশী । তার পেশীবহুল হস্ত-ছায়ায়, রাজহাঁস ও হস্তী দুইই খোলে ভালো ।

তাই মন্টি আজকাল, ওর গ্রামীণ জীবনের কোনো চিহ্ন রাখতে চায়না নিজ লাইফস্টাইলে । ও গেঁয়ো মন্টু নয় ; কেতাদস্তুর মন্টি !!

এক মহিলাকে বিয়ে করেছে । সে ব্যাঙ্কে কাজ করে । ঐন্দ্রিতা নাম তার । এই কেতাদস্তুর মহিলা, মন্টির শিল্পকলায় মজেছিলো । তখন মন্টি প্রতিমা গড়তো । ঐন্দ্রিতা সেখানে ঠাকুর কিনতে যায় । ওর অর্ডার ছিলো, মিশেল ওবামার মতন প্রতিমার মুখ ।

রীতিমতন ঝগড়া হয় তার -মন্টির সাথে ।

মন্টি এককথায় নাকচ্ করে দেয় । বলে যে মা কালীর মুখ হলে তাও চলবে কিন্তু সরস্বতীর মুখ ওরকম করা অসম্ভব । অনেক

টাকার টোপ দেয় ঐন্দ্রিতা । কিন্তু জয় হয় মন্টির । শেষে দেবীর মুখ হয় সোনাক্ষী সিংহের মতন ।

তারপরে বিয়েটা হয়েই যায় ক্রেতার সাথে ।

পরবর্ত্তীকালে ওদের দুই সন্তান হয় । পেন্সিল আর রবার । পেন্সিল মেয়ে আর রবার ছেলে । পিঠোপিঠি ভাইবোন । পেন্সিল দুরন্ত আর রবার শান্ত । ভাইবোনে খুব ভাব ! ঝগড়া করে আবার ভাবও হয়ে যায় ।

ফর্সা ও অল্প রোগাটে হল রবার আর পেন্সিল রোগা লিকলিকে ও কালো । মাথায় প্রায় একই দুজনে । রবারকে নিয়ে নয়, পেন্সিলকে নিয়েই বাবা ও মা বেশি চিন্তিত । কারণ তার অবাধ্যতা ও দুরন্ত স্বভাব । অন্যজন শান্ত ও বাধ্য বলেই হয়ত শুধু বাবা ও মা নয় সবারই প্রিয় । তবে রবারের দোষ আছে একটি । ও খুব ফুচ্‌কা খায় । বাড়ির সুস্বাদু খাবার ফেলে রেখে ফুচ্‌কা খেয়ে পেট ভরায় । কোনো হোটেলে খেতে গেলে আগেই জানতে চায় , কাকু তোমার এখানে ফুচ্‌কা রাখো না ? আশ্চর্য তো !

বাচ্চা ছেলেটির কথা শুনে হেসে ফেলে লোকে । অনেকে আবার ফুচ্‌কা রাখা শুরু করে ।

এদিকে দিদি পেন্সিল বলে ওঠে :: হাইজিনটা একটু কম না করলে ফুচ্‌কা খেতে ভালোলাগেনা । হাত ধুয়ে ফুচ্‌কা দিচ্ছো কেন ? নোংরা হাতে দেবে এবার থেকে বুঝলে !!

হেসে ওঠে রবার, বোনের কথায় । ঝড়ের গতিতে কথা বলে পেন্সিল ।

ওদের বাবা মন্টি ম্যান্ডেলা, নাকি অস্ট্রেলিয়াতে শো করতে গিয়ে ফুচ্‌কা খেয়ে এসেছে ।

ওখানে- সাহেবদের চালিত দোকানেও আজকাল বিরিয়ানি , চাট্‌, ফুচ্‌কা ইত্যাদি পাওয়া যায় ।

বাবা ওখানে গেম মিট্‌-ও খেয়েছে । যেসব পশুকে খেলার ছলে শিকার করে- মাংস খাওয়া হয় তাকে গেম মিট্‌ বলে ।

যেমন হরিণ, হাঁস, কোয়েল , ক্যাঙারু, গরু, মোষ, কুমির, উট্‌, কচ্ছপ------আরো নানা জাতের পশুপাখি । বাবা এরমধ্যে হরিণ ও ক্যাঙারু আর কোয়েল খেয়ে এসেছে । বাবাকে ওরা একটি বাচ্চা ক্যাঙারু দিয়েছিলো । আনা হয়নি । ওকে বাবা বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছে । ওখানে মেন রাস্তায় ক্যাঙারু আসে আর অনেকের বাগানেও ঢুকে পড়ে ।

অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট থেকে গ্রামে প্রায় যাওয়াই হয়না ওদের কিছুটা মন্টির জন্য তবে ওদের মা ঐন্দ্রিতা বা শর্টে **অনু** কিন্তু গ্রামে যেতে খুবই ভালোবাসে ,সবুজে হারিয়ে যেতে ভালোলাগে তার । কিছুদিন মুখোশের বাইরে জীবন কাটানো আরকি !

মন্টিকে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গও করে সে । বলে :: ভুলে যেও না তোমার শিকড় সবুজে গাঁথা । আর তোমার বাবা সবজি বিক্রি করলেও সৎ পথে খেটে খান । শহুরে মেকি মানুষের মতন কালো টাকা আর ঘুষের ওপরে বসে নেই !

স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই এই নিয়ে মনোমালিন্য হয় । আসলে নিজের বাবা-মাকে এই সামান্য কারণে ত্যাগ করার ব্যাপারটা একেবারেই না-পসন্দ্ ; অনুর । মানে ঐন্দ্রিতার । মন্টির নামবদলের ব্যাপারটাতেও সায় দেয়নি অনু । কিন্তু সেক্ষেত্রে মন্টির যুক্তি হল যে অবাঙালীরা মন্টু মন্ডলের চেয়ে মন্টি ম্যান্ডেলাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ । কাজেই কথা বাড়ায় না ঐন্দ্রিতা ।

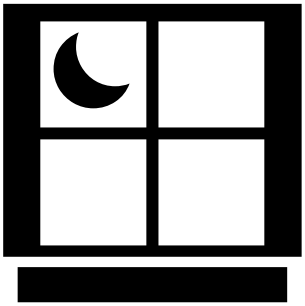

মন্টি একেবারে সাহেব । ব্রেড খায় , চিজ খায় , বেকন্ খায় । আজকাল সবকিছুই কিনতে পাওয়া যায় বাজারে । বাঙালিখানা , বিশেষ করে চচ্চড়ি ও মাছের ঝোল একেবারেই খায়না । পাছে কেউ ওর পরিবারের ইতিহাস ধরে ফেলে ! ও পাক্কা সাহেব । কাঁটা-ছুরি দিয়ে স্যুপও খায় !

দাঁত চিপে কথা বলে । হাই, হ্যাল্লো, গুড বাই , মাই-প্লেসার, ড্যাম-ইট্ আওড়াতে অভ্যস্ত । **অনেকে আড়ালে বলে : : ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক । অনেকে আবার বলে এটা ওর ইন্সিকিউরিটি কাজেই ছেড়ে দেওয়া হোক্ ওকে !**

যাতে শান্তি পায় তাই করুক ।

প্রতি শুক্রবার ও শনিবার পার্টি দেয় । বিকেলে ডিনার খেয়ে নেয় । হুইস্কি ও রামে স্বচ্ছন্দ । মাঝে মাঝে নাকি কোকেন

নিতেও দেখা গেছে । লাল-নীল চুল ও হলুদ দাড়ি । বিচিত্র সাজ পোশাক । প্যান্ট পরে হাফ্ । আসলে ফুল প্যান্টই ওটা কিন্তু স্টাইলের জন্য অর্ধেক ছেঁড়া । লোকে হাফ্ ভেবে ভুল করে । কিন্তু ছায়াবাজির আসরে তুখোড় সে ! তখন এইসব অবোধ সাইড নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না ।

মন্টির দুই সন্তানের মধ্যে অধিক চঞ্চল যে সেই পেন্সিল আজকাল এক আজব ব্যামোতে কাহিল ! সন্ধ্যা গাঢ় হলেই তার তাজা রক্ত লাগে ।

রক্ত খেয়ে বা পান করে সে হয়ে ওঠে রক্তকরবী ফুল !

সূয্যি ডুবলেই চাই রক্ত ! আঁজলা ভরা টাট্কা গাঢ় রক্ত !

প্রথমদিকে খেলার মাঠেই বন্ধুদের আক্রমণ শুরু করে । লুকানো ব্লেড দিয়ে ওদের দেহে ক্ষত তৈরি করে রক্ত- পান করতে উদ্যত হয় কিন্তু প্রতিবারই কারো না কারো হস্তক্ষেপে ব্যাপারটার ইতি ঘটে । অর্থাৎ রক্তপান আর হয়না ।

কিন্তু খবর ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে !

ছায়াবাজিতে নাম কেনা, মন্টি ম্যান্ডেলার একমাত্র কন্যা পেন্সিল নাকি লোকের রক্ত চোষে !

সন্ধ্যা নামলেই সে কাজে নামে । গুপ্ত ব্লেডের আঘাতে কেটে ফেলে বন্ধুর দেহ আর তারপর অবাক রক্তপান !

রটনা যাইহোক্ না কেন , ঘটনা হল এখনো তাজা রক্তপানের সুযোগ হয়নি তার ।

মন্টির ছেলে রবার কিন্তু দিদির এই কান্ডে অবাক হলেও লজিক দিয়ে বিচার করতে ইচ্ছুক !

তার দিদি এখনও কিশোরী । যুবতী নয় । আর গায়ে এত জোরও নেই যে কাউকে কাবু করে রক্ত খাবে । তবে কেন এই রটনা ?

দিদিকেই জিজ্ঞেস করে বসে ।

পেন্সিল বলে ওঠে :: জানিস্ ভাই আমার মাথার ভেতরে কেমন করে । মনে হয় মুঠো মুঠো রক্ত না পেলে আমি মরে যাবো । আর কোনো কোনো বাচ্চাকে দেখলে আমার তখন ওকে আছাড় মারতে ইচ্ছে করে । সবাইকে নয় । কাউকে কাউকে !

ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলার কথা তো লোকে জানেই কাজেই রটে যায় পেন্সিল বাঙালী ড্রাকুলা । এবং সে একজন মেয়ে । ফিমেল ।

অনেকে এও বলে যে ওর বাবা মন্টির এই সাহেব হতে চাওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে । কোনো অশুভ আত্মা হয়ত ওকে ভড় করেছে যে কোনো সাহেবের দেহে ছিলো আগে ।

কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের ব্যাপারে কিছু বলার নেই রবারের কারণ একমাত্র টেকনোলজি দিয়ে বিপ্লব করলেই মানুষের অনেক অন্ধবিশ্বাস কাটানো যাবে , তার আগে নয় । কিন্তু দিদির হঠাৎ এরকম মনে হচ্ছে কেন ?

অশুভ আত্মা দিদির ওপরে ভড় করেছে এসব গাঁজাখুড়ি রবারের আধুনিক মনকে ব্যঙ্গ করছে । তবুও সে এই বিষয়ে তদন্তে আগ্রহী হয় । দিদির সাথে গভীর আলোচনা করে । নানান ভিডিও দেখে ও অকাল্ট ওয়েবপাতা পড়ে জানতে সক্ষম হয় যে রক্তচোষা আমরা যাকে বলি **সেরকম ডাইনি জাতীয় কিছু -- অশুভ আত্মার কবলে পড়া মানুষ সত্যি সত্যি সমাজে থাকলেও, আরো একটা জিনিসও আছে** । সেটা হল একটি অসুখ । এই অসুখটির নাম Renfield's syndrome--!!

অর্থাৎ ক্লিনিক্যালিও মানুষ ভ্যাম্পায়ার হতে পারে । যদিও এই অসুখটি নিয়ে খুব বেশি চর্চা হয়না তবুও অনেক মানুষ এর

অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন । তারা চিকিৎসক, মনোরোগ বিশারদ্ ও বিজ্ঞানী বটে !

এই অসুখের কোনো ওষুধ নেই । চিকিৎসা নেই । শুধু পেশেন্টকে রক্ত সরবরাহ করা ছাড়া !

বাড়ির আবহাওয়া খুব বিষণ্ন । নেতিয়ে পড়েছে পেন্সিল ও তার কারণে অন্যরা । রবারও চিন্তিত । কিছু একটা করতেই হবে !

এই পর্যন্ত দিদিকে পাঁঠার রক্ত দিয়েছে বাড়ির লোক । ঘরে তাকে বন্দিনী করে রাখা হয়েছে ।

স্কুল থেকে ওকে বহিস্কার করেছে । একজন টিচার বাসায় এসে পড়ায় । কিন্তু সবাই ওকে সন্ধ্যা হলেই ঘরে ; বন্দী করে ফেলে । তখন পাঁঠার রক্ত , বোতলে করে খেতে দেওয়া হয় । সেই কাজটি করে স্বয়ং বাবা ! কারণ মাও ওর কাছে যেতে ভয় পায় কেমন !

ওদের পোষা কুকুর ঘসেটিকে ওরা কেনেলে দিয়ে এসেছে । পাছে দিদি ওকে কেটে রক্ত চোষে ! কিন্তু অপমানিত হয়ে ঘসেটি নাকি সেখানে আত্মহত্যা করেছে ; না খেয়ে শুকিয়ে গিয়ে !!

নিজের অজান্তেই মানুষ, এমন সব পরিস্থিতির সাথে জড়িয়ে পড়ে যে আগে থেকে আঁচ পেলেও কিছুই করার থাকেনা ! নিজের প্রিয় দিদির মুখ থেকে যে এমন রক্ত চলকে পড়বে কোনোদিন কি ভেবেছিলো রবার ? শতবার মুছলেও সেই রক্তকণা ওঠানো যায়না । আশ্চর্য ক্ষমতা তার ! এই রক্তের দাগ মানুষকে মারে, বাঁচায় না ।

দিদি , রবারকে প্রায়ই বলে :: ভাইটি মোর, সন্ধা হলেই আমার গলায় কেমন যেন একটা সুড়সুড়ি লাগে আর মাথায় একটা চাপ ধরে আর তারপরেই আমার রক্ত খেতে ইচ্ছে করে । আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনা । আর ছোট ছোট বাচ্চা

দেখলেই বিশেষ করে কোনো মেয়ে , আমার ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মাথাটা গুঁড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় নাহলে বুকের ভেতরে কেমন করে !!

লোকে এমনও বলে যে পেন্সিলকে বাদুর কামড়েছে । এমন এক বাদুর আছে যারা রক্ত খায় । আগে মনে করা হত তারা পশুর রক্ত খায় । কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তারা মানুষের রক্তও পান করতে পারে । এই বাদুরের লালা দিয়ে বিজ্ঞানীরা আজব ওষুধ তৈরি করেছে যা দিয়ে হার্ট অ্যাটাক থেকে মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব কারণ লালায় এমন সব রসায়ন থাকে যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয়না ।

এই বাদুরের নাম রক্তিম । কাজেই পেন্সিলকে হয়ত কোনো রক্তিম কামড়েছে ।

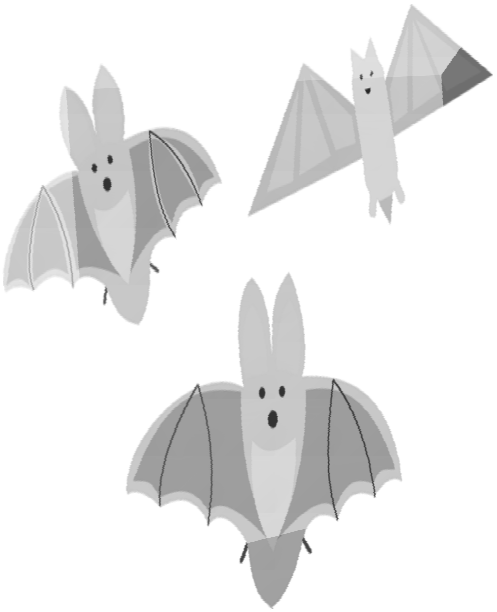

যে যাই বলুক রবার জানে এটা আসলে এক প্রকার অসুখ । কেউ দিদিকে কামড়ায়নি ।

আজকাল দিদি ঘরবন্দী থাকে । সারাটাদিন কাঁদে । মাঝে মাঝে অনলাইন বন্ধুদের সাথে গল্প করে ও অনলাইন গেম খেলে সময় কাটায় ।

ওরা দেখা করতে চায় কিন্তু দিদি যে রক্ত চোষে তা তো ওরা জানেনা । জানলে কী আর বন্ধুত্ব রাখবে ?

দিদি ; লুডো খেলতে ভালোবাসতো খুব । এখন একা একা সাপ-লুডো খেলে । রবারের পর্যন্ত ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই । কাজেই লুডোতে শুধু স্নেক্ ল্যাডারটাই খেলে গৃহবন্দী ও সাঁঝের সময় ঘরবন্দী-- পেন্সিল ।

একমাত্র দিদি ও প্রিয় বোনের জন্য ভারি দু:খ হয় রবারের ; কিন্তু কিছু করার নেই কারণ এই অসুখের কোনো চিকিৎসা নেই ।

ওদের বাড়ির কাছেই ইলিশ মাছের দোকান আছে । সেখানে রোজ সকালে লক্ষ লক্ষ মাছ আসে, চালান হয়ে । বড় বড় হাঁড়িতে করে ইলিশ মাছগুলি- ফুলের মতন করে সাজিয়ে নিয়ে মেয়েরা দোকানে যায় । মাছের লেজটা ওপরের দিকে করে এমন সুন্দরভাবে সাজানো থাকে যে রোদ পড়ে চক্‌চক্‌ করে আর মনে হয় যেন চাঁদের আলোয় ইলিশ মাছগুলো বাতাসে ভাসছে ।

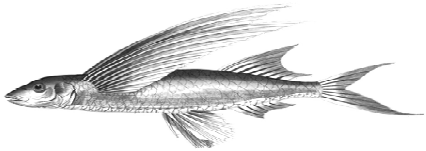

দিদি ঘরবন্দী হয়ে মাছের হাঁড়ি দেখে ।

একদিন ও মাছ খেতে চেয়েছিলো । তখন মা দোকানে মাছ কিনতে গেলে কয়েকজন লোক নাকি মাকে বলে ওঠে ::

আপনার মেয়ে তো রক্ত খায় । মাছও খায় নাকি ? নাকি ইলিশের রক্ত খাবে বলে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন ?

শুধু শুধু ইলিশটা নষ্ট করবেন দেখছি ! জানেন না আজকাল ইলিশের আকাল ? অতিরিক্ত মাছ ধরে বলে ? অসময়ে বরফের মাছ খায় বলে ?

তার মধ্যে আপনি আবার খামোখা মাছগুলি কিনে নিয়ে নষ্ট করছেন কেন ? খেতে হলে কিনে নিয়ে যান । রক্ত চোষা মেয়েকে খুশি করতে নয় !

শুনে রবারের চোখ ছানাবড়া । ওর চোখ দুটি অবশ্যই বেশ বড় বড় ও গোল গোল । রসগোল্লার মতন । সেই চোখ আরো গোল হয়ে যায় ফুটবলের মতন । আর রাগও হয় খুব । ইচ্ছে করে দিদির মতন ঐ লোকগুলোর মাথাটা চিবিয়ে খেতে !

নিজের মেয়ের এমন হলে তখন নানান কাঁদুনি গাইতো । অন্যের হয়েছে বলে ব্যঙ্গ করছে ।

রবার ; এই ছোট্ট জীবনেই দেখেছে কীভাবে প্রতিটি মানুষ একে ওপরকে অপমান করছে ।

তারওপর দিদির এই অবস্থা দেখে অনেকেই সুযোগ পেয়ে গেছে । কিন্তু দিদি কী করবে ?

এটা তো ওর অসুখ ! আর বাবা ও মা ওকে এমন সাবধানে রেখেছে যে বেচারি এখনও কোনো মানুষ কিংবা পশুর ক্ষতি করেনি । শুধু পাড়ার হারু কসাইয়ের কাছ থেকে বাবা নিয়মিত পাঁঠার রক্ত কিনে আনে । কারণ সন্ধ্যা হলেই দিদির রক্ত লাগে ।

পশুর রক্ত পান করে শান্ত হয়েই আছে দিদি ।

ও অবশ্য জানে এগুলি মানুষের রক্ত ।

ওকে সেরকমই বলা হয়েছে ।

এদিকে দিদির বন্ধু রুহি যে ওর ক্লাসমেট , সে সবার চোখ এড়িয়ে দিদিকে দেখে গেছে । টিউশান পড়তে এসে লুকিয়ে দিদির সাথে আড্ডা দিয়ে গেছে । খুব কেঁদেছে দুই বন্ধু !দিদির এমন অবস্থা দেখে রুহি নিজের বুকের কষ্ট সামলাতে পারেনি । রুহির কাছেই ওরা জেনেছে যে জুহা মাড়ওয়া নামে এক যুবক নাকি ইদানিং শহরে ঘোস্ট ট্যুর চালাচ্ছে । সে মোটা টাকার বিনিময়ে মানুষকে ভূত দেখাতে নিয়ে যায় । জুহা নাকি বলেছে যে দিদির জন্য বাবা-মাকে ও অফার দেবে । ঘোস্ট ট্যুরে এসে লোকে দিদিকে দেখবে । সাক্ষাৎ একজন মহিলা ভ্যাম্পায়ার বলে কথা !

জ্যান্ত ; রক্তচোষা এক মেয়েকে দেখতে নিশ্চয়ই শহর হামড়ে পড়বে । তাতে অনেক লাভ হবে জুহার আর এর আগে হয়ত কোনো দেশেই এরকম জ্যান্ত মহিলা ড্রাকুলা কেউ দেখেনি । তাই বিদেশীরাও আসবে ফেসবুকে ঘোষণা করলেই !

প্রস্তাব শুনে গা জ্বলে গেছে রবারের ! যেন ছেলে খেলা ! একজন কিশোরী কত কষ্ট পাচ্ছে এই আজব রোগে । তাকে সহানূভূতি না জানিয়ে লোকে ওকে নিয়ে ব্যবসা করার মতলব করছে । জুহা নাকি এও বলেছে যে দিদিকে কিছুদিন পরেই সরকার মেরে ফেলবে । কারণ এরকম এক ব্লাড সাক্ করা মেয়েকে আইন---

হেসে ,খেলে বেড়াতে দেবেনা । আর মৃত্যুর পরে ওর দেহটা জুহা নিয়ে যাবে । ওকে মমি করে রেখে দেবে । লোকে ওকে দেখতে আসবে । সাক্ষাৎ বাঙালী এক ভ্যাম্পায়ার । মা -কালীর রাজ্যে রক্তচোষা মেয়ে একজন । মা-কালীর মতনই রক্ত খায় । বাঙালীরা তো সবই খায় । চা খায় , জল খায় আবার মিষ্টিও খায় । **ওদের মধ্যে জল বা রক্ত ,পানের ব্যাপার নেই ।** এমনকি পানও ওরা জর্দা দিয়ে সেই খায় ! আর জুহা মাড়ওয়া খালি লাভ খায় ; ক্রেতার পরিশ্রমে ভেজা ঘাম পান করে ।

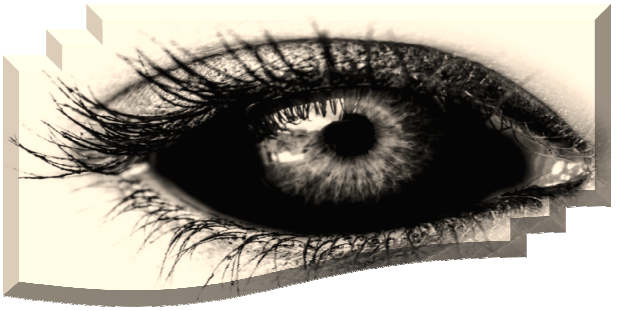

মূল কলকাতা হয়ে ওঠা গড়িয়ার অনতিদূরে

সাহেবগঞ্জ । এখানে আগে নাকি অনেক সাহেব ও মেমসাহেব বাস করতো । বেশির ভাগটাই গ্রাম্য পরিবেশ কিন্তু তারই মাঝে সাহেবরা বাস করতো । অনেকে স্থানীয় চাষাদের সাথে হাত মিলিয়ে চাষ করতো । অনেকে দুধের ব্যবসা করতো । তখন তো হরিণঘাটা ছিলো না । লোকাল গরু, মোষ ও ছাগল দুধ সরবারহ করতো ।

এই সাহেবগঞ্জই রবারের বাবার গ্রাম । রবারের মা নিয়মিত এখানে আসে আর দাদু-ঠাকুমার সাথে দেখা করে । কখনো কখনো বাবার আড়ালে রবার ও পেন্সিলও আসে এখানে । বাবা জানলে আর রক্ষে নেই ! বাবাকে লুকিয়ে কেন তার বাবার কাছে মা আসে তা রবার জানে না । কেবল জানে যে দাদু-ঠাকুমা হল গেঁয়ো । ওদের কলকাতায় আনা অসম্ভব কারণ শহরের লোকেরা এসব গাঁইয়াদের একদম সহ্য করতে পারেনা । ওরা লেখাপড়া , আদব-কায়দা কিছু জানেনা , শেখেনা- তাই ।

বাবার কিছু বন্ধু নাকি জানতে পেরে গিয়েছিলো তখন বাবা বলেছে যে ওখানে বাবার বিশাল জমিদারি আছে আর দাদু হল ওদের কেয়ার টেকার । বাবার বাবা- ওকে কাজে লাগায় সৎ ও পরিশ্রমী বলে ।

শুনে রবারের খুব অবাক লেগেছিলো । নিজের বাবাকে কেয়ারটেকার বলার কী বা দরকার থাকতে পারে সে জানেনা । দাদুকে তার খুবই ভালোলাগে । সাহেবগঞ্জে গেলে দাদুর সাথে ক্ষেতে নামে । কত চাষ হচ্ছে সেখানে । সবুজ সবুজ তাজা ক্ষেতগুলি রবারের মন মাতায় ।

ওদের বাড়ি তো ফ্ল্যাটে । সেখানে কোনো মাটির বালাই নেই । ওরা মাটি কেনে । টবে বসায় । তাই বুঝি গাছগুলি কেমন মিইয়ে থাকে । কিন্তু দাদুর ক্ষেতে প্রতিটা গাছ কেমন খিলখিলিয়ে হাসছে !!

বাবাকে কয়েকবার প্রশ্নও করেছে । কিন্তু বাবা বলেছে যে ও বড় হলে বুঝতে পারবে ।

রবার ; বাবাকে কিছু বলেনি কিন্তু দিদিকে বলেছিলো যে ওরাও যদি বাবাকে ওদের কেয়ার টেকার বলে পরিচয় দেয়, ওদের বন্ধুদের কাছে তখন বাবার কেমন লাগবে ? ওদের বাড়িতে দাদু-ঠাকুমা কখনোই আসবে না । বাবা আসতে দেবেনা । এলেও নাকি নিচে দরোয়ানের ঘরেই থাকবে । কেয়ারটেকার কি আর মালিকের সাথে থাকে ? তাই ।

ইদানিং সন্ধ্যা নামলেই যে দিদির রক্ত-নখ বার হয় তা দাদুকে জানিয়েছে মা । দাদুর বাসায় মা---ই একটা মোবাইল ফোন দিয়ে এসেছে । তাই দিয়ে মায়ের সাথে ওরা যোগাযোগ করে ।

রবার, মাকেও জিজ্ঞেস করে দাদুর ব্যাপারে । কেন ওদের বাবা মন্টি ম্যান্ডেলা এরকম করে। মা বলেছে যে দাদু ও ঠাকুমাকে মা খুবই ভালোবাসে । ওরা বুড়ো হয়ে গেছে তাই কেতাদস্তুর পোশাক পরেনা আর । আর ওরা ওদের মতন । **সহজ ,সরল ও সৎ ।**

মিথ্যে কথা বলে না মোটেই । আর মানুষ ভালোবাসে । তাই মা ওদের খুব পছন্দ করে । বাবা না করলেও । রবারের তো দাদুদের ভালোলাগেই আর পেন্সিলও ওদের ভালোবাসে । দিদির নাকটা খুব চোখা বলে দাদু ওকে মজা করে বলে ---**তোমার নাকটা পেন্সিলের মতন গো মেয়ে !**

মা ; মোবাইল ফোনে দাদুকে জানিয়েছে দিদির ব্যাপারটা । আর তারা যে কতবড় একটা ফ্যাসাদে পড়েছে সেটাও ।

ঠাকুমা , যাকে ওরা ডাকে ঠামা বলে খুবই চিন্তায় পড়েছে । কিন্তু বাবা বেঁচে থাকতে ওদের ফ্ল্যাটে আসা নিষেধ ।

মাঝে মাঝে বাবাকে ; রবারের ঘর সাজানোর গাছ মনে হয় । প্লাস্টিকের গাছ আর কি !

কোনো শিকড় নেই । মাটি নেই । প্রাণ নেই । শুধু আধুনিক সমাজে, মিথ্যে ফেরি করে বেঁচে আছে । গাছের অস্তিত্বটাই শুধু সত্যি । আর সবই মিথ্যে ।

রবারকে ওর বন্ধুরা ডাকে grandpa বলে ।

ওরা বলে :: তুই দেখতে এই এত্তোটুকু ! কিন্তু তোর ভাবনাচিন্তা গুলো বুড়োমানুষের মতন ।

তোর বাবা প্লাস্টিকের গাছ হলে তুই হলি বট গাছ । ডাইনোর বন্ধু একেবারে !!!

দাদুই শেষমেশ দিলো উপযুক্ত সমাধান ।

এক রোগের শিকার নাত্নি পেন্সিল । এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই কিন্তু মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার । স্নেহের কারণে ।

আর ওদের বংশে নাকি আগেও এরকম এক মহিলা ছিলো । তার রক্ত খাবার প্রবণতা দেখে গ্রামের লোকে ওকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারে ।

জীবন্ত এক মহিলাকে পুড়িয়ে মারছে আর কেউ প্রতিবাদ করছে না দেখে ওদের এলাকার মেমসাহেব মেয়ে ডেবোরাহ্ উন্মাদ হয়ে যায় । পরে নাকি সে রাস্তায় ক্ষমা ভিক্ষা করতো **! ------- আমাকে একটু ক্ষমা দেবে তোমরা ? নো কেক্ অর্ বিস্কিট্ , অন্লি আ লিটিল বিট্ অফ্ ফরগিভ্নেস্ ।**

ময়লা পোষাক, এলোমেলো জটধরা চুল । আর মুখে ঐ কথা ছিলো তার । সোনার বরণ-- রোদে , জলে পুড়ে তেতে কালো হয়ে গিয়েছিলো ।

নিয়মিত রক্তপান করা সেই মহিলা ; ওদের বংশে কালির দাগ আঁকলেও, তাকে যেই প্রিয়জনেরা রক্ষা করতে চেয়েছিলো তারা পারেনি কারণ কেউ জানতো না যে এটা আসলে ওর মানসিক রোগ । অশুভ আত্মা ও ডাইনির গল্পই সবাইকে মোহিত করতো । **মানুষ আসলে কল্পনা করতে ভালোবাসে । তাই গল্পের ডাইনি-বুড়িই লোককে বেশি আকর্ষণ করে বাস্তবের অসুস্থ মানুষের চেয়ে ।** তাই দোলের আগে, ন্যাড়াপোড়ার মতন সেই মহিলাকে গ্রামের লোকে পুড়িয়ে মারে ।

দাদুর নাকি এই ঘটনাটায় খুব দু:খ হত । তাই নিজের নাত্নির ক্ষেত্রে যেই প্রস্তাবটা দাদু দিলো তা হল :: আগের ঘটনার সময় তো আমি ছিলাম না কারণ আমি তখনও জন্মাই-নি কিন্তু এখন আমি বেঁচে থাকতে, আমার এত্তোটুকু সোনার মেয়ে নাত্নিকে -কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তার বাবা -মায়ের বুক থেকে ।

আমার একটা পরিকল্পনা আছে । তা হল ; এই যে আমাদের এখানে ক্ষেতে, এত্তো বিট্ গাছের চাষ হয় -- সেই বিটের রস বানিয়ে ওকে মানুষের রক্ত বলে দেওয়া হোক্ । পাঁঠার রক্ত

আর নয় । এই রস স্বাস্থ্যের পক্ষে দারুণ উপকারি আর দেখতেও একদম গাঢ় লাল রক্তের মতন । কাজেই ও কিছু বোঝার আগে পুরোটা পান করে ফেলবে । এই পুরো ব্যাপারটাই গোপনে করা হবে । আরো বড় কথা হল এই যে ওদের বাবাকে দিয়ে একটা কৃত্রিম মানুষের মূর্তি বানাও । আগে তো সে প্রতিমা গড়েছে কাজেই মানুষও গড়তে পারবে । সেই মূর্তি এমন হবে যাতে আসল মানুষ বলে মনে হয় ।

মূর্তির ভেতরে ভরে দেওয়া হবে বিটের রস ।

ও এসে ; ঐ মূর্তিতে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত খাবে । আর মনে করবে যে সে সত্যি সত্যি মানুষের রক্তপান করছে । বিটের রস খেয়ে খেয়ে হয়ত একদিন এই অসুখও সেরে যাবে , কে জানে ?

হ্যাঁ , স্বাদটা হয়ত অন্যরকম লাগবে কারণ সে পাঁঠার রক্ত খেতে অভ্যস্থ । সেই ব্যাপারে ওকে কিছু একটা বানিয়ে বলতেই হবে । ওর মঙ্গলের জন্য ।

সবকিছু শুনে টুনে বাবা বললো :: হ্যাঁ , অনেক জায়গায় পড়েছি যে বিট্‌কে সুপারফুড বলা হয় । আর বিট্ খেলে মস্তিস্কের কাজ ভালো হয় ও মাথা ঠান্ডা হয় । হয়ত এতে করে পেন্সিলের রোগটাও সেরে যেতে পারে , কে জানে ! **মাথার ব্যামো বইতো নয় ।**

এরপর দাদুর পরামর্শ মতন বাবা বহুদিন পরে ছেনি হাতুড়ি নিয়ে বসলো । আধুনিক ফাইবার দিয়ে তৈরি হল এক কৃত্রিম মানুষ । তারমধ্যে কিছু কলকব্জা ভরে, তাকে একেবারে রিয়ল মানুষ করা হল । বাবা এরজন্য একবার বিদেশেও ঘুরে এলো । রবারও বাবার সাথে গেলো । কাজের সময় বাবাকে সাহায্য করলো । নিজেও অনেক মূর্তি গড়ার কাজ শিখে নিলো । সত্যি, কোনো শিক্ষাই কখনো ব্যর্থ হয়না আর কার কখন কিসের দরকার পড়ে কেউ বলতে পারেনা । এখন বাবা তো দাদুরই কথামতন কাজ করছে । যদিও বাবা হয়ত বলবে যে কেয়ারটেকারের কাজ কেয়ার করা তাই দাদু যা করছে তা আসলে ওর ডিউটির মধ্যেই পড়ে কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর তা নয় ! কাজেই দাদুর প্রতি বাবার আদর বাড়াতে ; মনে মনে রবার খুব খুশি !

সেই মানুষের ভেতরে ভরে দেওয়া হল তাজা বিটের রস । তার দেহে ; পিন ফোটালেই ফিন্‌কি দিয়ে বার হচ্ছে লাল লাল গাঢ় রক্ত ওরফে বিটের রস । আর সেই রক্ত এখন শুধু পেন্সিল নয় ; লুকিয়ে চুরিয়ে রবারও খেয়ে নিচ্ছে ! হয়ত বা বাবা ও মাও !

তবে পেন্সিল খুবই বুদ্ধিমতী - তাই নতুন রক্ত পেয়েই প্রশ্ন করে ওঠে বাবাকে :: বাবা , বাবা এই রক্তের স্বাদ একেবারেই আলাদা ! এটা কি অন্য কোনো জাতের মানুষের রক্ত ?

এই প্রশ্নটা শুনতে সরল হলেও আসলে এক কঠিন প্রশ্ন ! তাই বুঝি বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে । তারপর দিগন্ত বিস্তৃত বিট্ ক্ষেতের দিকে চেয়ে -- অফবিট্ মেয়েকে বলে ওঠে :: **এই মানুষের ব্লাড গ্রুপটা আসলে আলাদা, আগের মানুষের চেয়ে ।**

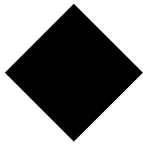

এই যা , বলাই হয়নি এই বিটের ক্ষেত হল সাহেবগঞ্জে । দাদুর বাসার কাছে । দাদুর ক্ষেত । আর বাবা এখন সবাইকে নিয়ে দাদু-ঠামার কাছে আছে । ওরাও খুব শীঘ্রই যাবে রবারদের ফ্ল্যাটে । দিদি অর্থাৎ পেন্সিলও খুবই খুশি এই কথা শুনে । কারণ দাদু নাকি তার জন্য তাজা রক্ত , বোতলে ভরে আনবে । কষ্ট করে আর নতুন মানুষের গায়ে পিন ফুটিয়ে- বার করতে হবেনা , পেন্সিলকে । একদম পেপ্সির মতন ডাইরেক্ট বোতল থেকে খাবে তাজা , গাঢ় মানব রক্ত , আদতে বিটের জুস্ ।।।

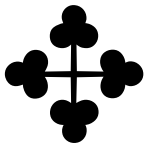

অবাক রক্তপানের ব্যবস্থা হয়েছে বলে দিদি এখন আর বন্দিনী নেই । ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । কারণ পিপাসা পেলেই ভরসন্ধ্যায় ও ধাবিত হয় অন্যমানুষের দিকে আর পিন ফুটিয়ে পান করে অঢেল রক্ত । শুধু অপেক্ষা এখন দাদুর আবির্ভাবের !! তখন আর পিন ফোটানোর সময়টাও নষ্ট করতে হবে না । তৃষ্ণার মহালগ্নে !

রবার নিজের ওয়েবপাতায় এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে । এক সাহেব সেই লেখা পড়ে ওকে তার দেশে যাবার নিমন্ত্রণ করেছে । অবশ্যই দিদিকে সাথে নিয়ে । কারণ ঘটনাটি সত্য ।

আর দিদি , পেন্সিলের জন্য গোরা সাহেব , সাহেবগঞ্জে নয় খোদ পরবাসে অনেক অনেক বিট্ জুসের ভান্ডার খুলে রেখেছে । কারণ তার স্বপ্ন ছিলো সত্যি ভ্যাম্পায়ারের দেখা পাওয়া । সবই তো গল্পে পড়া হয় কিংবা কোনো না কোনো সিনেমা ও নাটকে দেখা হয় । এরকম আস্ত এক ফিমেল ড্রাকুলার দেখা পাবে- ভেবেই লোম খাড়া হয়ে গেছে সাহেবের ।

ঘটনাচক্রে জানা গেছে যে তার নাম ব্রাম স্টোকার । হয়ত নামী লেখকের কোনো বংশধর ! কে জানে ?

পেন্সিল ; কোনো মানুষের রক্ত না খেয়ে নকল মানুষের রক্তপানেই ব্যস্ত থাকে শুনে সাহেব অবাক । অবাক এইজন্য যে এই আজব ব্যাপারকে, পেন্সিলের বাড়ির লোকেরা কীভাবে আয়ত্বে এনেছে । সত্যি -গরীব দেশ ভারতের কাছ থেকে আজও অনেক কিছুই শেখার আছে ! **মুগ্ধ সাহেব শীঘ্রই পেন্সিলের সাথে দেখা করবে । ব্যাগ গুছাতে ব্যস্ত রবার ; কিছুদিন এই কারণে স্কুল ফাঁকি দেবে । তাতে কি ?**

একটি নতুন দেশ দেখবে , জানবে ! এও তো শিক্ষা ! ক্লাসরুমের শিক্ষার থেকে কোনো অংশে কম নাকি ?

THE END

Images: www.pixabay.com

and clipart.